আমেরিকায় বাংলা ছোটগল্প

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

এই লেখায় কথোপকথনের ভংগিতেই উপস্থাপনা করছি আমার কিছু ভাবনা - চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একটা নির্যাস। আমাকে যে কিছু লিখতে হবে, এই ব্যাপারটা দু'দিন মাত্র আগেই জেনেছি। তাই একদিকে ভালই হ'য়েছে। খুব গুরুগম্ভীর উচ্চকিত লেখার দরকার নেই। যেমন যেমন মনে আসছে, লিখছি। মাঝে মাঝে বাক্যহীন হ'য়ে যদি অপ্রস্তুত হই, আপনারা ক্ষমা-ঘেন্না করে নিজেদের মত করে বলা বা না-বলাকে গ্রহণ করবেন।

আমেরিকায় বাংলা ছোটগল্পের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে প্রথমে আমেরিকার বাঙ্গালিদের ব্যাপারে কিছু বলতে হয়। আমেরিকা বলতে এখানে আমি উত্তর আমেরিকার কথা বলছি। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা মেক্সিকো — এখানকার হালহকিকৎ আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়।

উত্তর আমেরিকার মধ্যে আমি কানাডা ও ইউ এস এ — দুটো দেশকেই ধরছি। বিশাল এই ভূমিখণ্ড। ইউ এস এ-র পূর্ব থেকে পশ্চিমে দ্রুতগতি জেট বিমান লাগে পাঁচঘন্টা। তিন হাজার মাইলের ব্যাপ্তি। ভারতবর্ষের তিনগুণ বড়। সেই বিশাল মহাদেশের জনসংখ্যা ২৭২ মিলিয়ন। তার মধ্যে বর্তমান ভারতীয়দের সংখ্যা মোটামুটি এক মিলিয়ন। দশ লক্ষ। তার দশ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। অর্থাৎ মাত্র একলক্ষ।

বাংলাভাষাভাষীর অন্য বড় গোষ্ঠী হল বাংলাদেশি বাঙালিরা। তাদের কথায় পরে আসবো। এখন পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা বেশিসংখ্যায় আমেরিকা গেছেন ষাট/সত্তর/আশির দশকে। এরা মূলত আছেন বড় বড় শহরে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, শিকাগো, বস্টন, আটলান্টা, হিউস্টন, লসএঞ্জেলস ও সানফ্রাসিসকোতে। ছড়িয়ে, ছিটিয়ে আরো অনেকে অবশ্যই আছেন নানা ছোট বা মাঝারি শহরে।

এই বাঙালি অধিবাসীদের কতকগুলি সাধারণ চরিত্রচিহ্ন আছে। এরা অধিকাংশই এসেছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে। পেশায় অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার। কিছু ডাক্তার, গবেষক, বিজ্ঞানী। এবং ছাত্র। এছাড়া অনেকে তাদের বাবা, মা-কে নিয়ে গেছেন। আর এই পঁচিশ - তিরিশ বছরে একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, যাদের কথা খুব জরুরি এবং আমি পরে তাদের কথায় আসছি।

আমি আগেই যা বললাম, অধিকাংশ বাঙালির আমেরিকা ছাড়পত্র হল বিজ্ঞান। সাহিত্যকেন্দ্রিক বৃত্তিধারীর সংখ্যা খুব কম। যারাও বা আছেন, তাঁরা মূলত ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। বাংলার নয়। ওদেশে বাংলা খবরের কাগজ সে হিসেবে তেমন কিছু নেই। তাই নিয়মিত বাংলাচর্চার ক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ।

তবু বাঙালিরা লেখেন। লেখবার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন শহরে তাদের সংগঠন থেকে, ক্লাব থেকে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশ হয় পুজোর সময়। এছাড়া প্রতিবছরই বড় করে শহরের মানুষরা ঘুরে ফিরে এক-একটা বড় শহরে জমায়েত হন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। সেখানে সীমিত হলেও কিছু সাহিত্যচর্চার চেষ্টা হয়। পত্রিকা প্রকাশ হয়, সেমিনার হয়, কবিতা পাঠও হয়।

এই প্রেক্ষিতে কি ধরনের সাহিত্য সম্ভব? ছোটগল্পের উৎস কোথায়? কবিতা আমাদের মনের আবেগ থেকে, জানা-অজানা ভাব থেকে, ব্যক্তিগত বোধ, আনন্দ - বেদনা থেকে জন্ম নেয়। তাই কবিতা হঠাৎ কেমন করে কোথায় ফুটে ওঠে বোঝা মুস্কিল। কবিতার সৃষ্টি নির্জনেই ভাল হয়। একান্তে। তারজন্য পঠনপাঠন তেমন দরকারি নয়। সে আপনি আসে, আপনি ভাসে।

প্রবন্ধ, ভ্রমণ - কাহিনী ইত্যাদি একধরনের লেখা, যেখানে পঠন - পাঠন খুব দরকারি। তথ্য ও তত্ত্ব যাই হোক, তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পণ্ডিতি ব্যাপার। সৃজনশীলতা অবশ্যই ক্রিয়মান। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটাই ছকবন্দী। সে কবিতার মতো কল্পলোকের সৃষ্টি নয়। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানীদের বড় বড় গ্রন্থরাজির মধ্যে তার উৎস।

ছোটগল্পের উৎস কিন্তু বইপড়া বিদ্যের মধ্যে নয়। গল্পতো গল্প হলেও গল্প নয়। গল্প বই পড়ে লেখার নয়, গল্প মানুষের। সমাজের। জীবনের। আমাদের আশে - পাশের প্রকৃতি পরিজনের। এদের জন্যই লেখা, এদের নিয়েই লেখা। এখন বিদেশে যাঁরা গল্প লিখছেন, তাঁদের বাংলাভাষায় মোটামুটি দক্ষতা থাকলেও সমাজের অন্তঃপুরে তার গতি নেই। বাঙালিসমাজ তো অতি সীমিত সেখানে। আর আমেরিকান সমাজের ড্রইংরুমেও আমাদের অতি সীমিত যাতায়াত। সুতরাং গল্পের মূল উৎসই সেখানে অতি ক্ষীণ। সৃজনমূলক লেখার অন্য যে উপাদান জীবন, যেখানে আছে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, রাগ, প্রেম, ভালবাসা, আবেগ ইত্যাদি তা সেখানে বড়ই স্তিমিত। এই আমাদের প্রজন্মের যে সাহিত্য বিদেশের মাটিতে তা হল Immigrant's Literature, অভিবাসনীয় সাহিত্য। Literature in Exile বা নির্বাসিতের সাহিত্য নয়।

নির্বাসিতের সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্তরে কালজয়ী বহু সাহিত্যের প্রসূতি সদন। এই সাহিত্যের মূল ঐক্যসূত্র হল যন্ত্রণা। সমাজজীবনের যন্ত্রণা ব্যক্তিবিশেষের মানসে যে ঝড় বইয়েছে, যে আগুন ধরিয়েছে তারই দাবানল।

যেমন সাহিত্য তৈরি হয়েছে, পস্টারনেক কি সোলঝেনিৎসির হাতে। কিংবা এযুগে সলমন রুশদির হাতে কিংবা এডুয়ার্ড সইদের লেখায়। এমনকি তলল্লিমা নাসরিনের লেখায়। ঘরের কাছে, দেশভাগের অভিঘাতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়, বা ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে — সেই পরিণাম দাহ ও যন্ত্রণা আমেরিকা-বাসী বাঙালির মধ্যে অনুপস্থিত। তাই চোখে পড়ার মত, হৃদয়ে টান দেবার সাহিত্য আশা করা বাতুলতা।

আমেরিকায় আমাদের যাত্রা আকাঙ্খার ডাকে। আরও চাহিদা, আরও সঞ্চয়, আরও লোভের ভিড়ে বাইরেটাই ভরে উঠছে দোকানের মালে, ভেতরের সম্পদ সেখানে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি ও মানসিকতায় ভাল গল্প তৈরি হয় না।

এছাড়া অন্য দিকও আছে। লেখালেখির জন্য একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া দরকার। যাকে বলি চর্চা। সমাজ ও মানুষকে দেখা, পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও লেখার জন্য একটা শৈলির ব্যাপার আছে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যাপার আছে। আড্ডার প্রয়োজন আছে। এইরকম মেলা, অনুষ্ঠানের দরকার আছে। আমি কি লিখছি, তার সঙ্গে সুকান্ত কিংবা কিন্নর কেমন লিখছে, সেটা

নিজেই পড়ে দেখার, বোঝার দরকার আছে। সামগ্রিকভাবে একটা সময়ের লেখা কোনদিকে যাচ্ছে— তার সঙ্গে আমার লেখা তুলনামূলকভাবে কোথায়, এটা বিচার করবার দরকার আছে। আমার লেখা পড়ে সৌম্য বা গৌর বলতে পারে লেখাটার দুর্বলতা কোথায়, কোন্ জায়গাটা বাহুল্য, কোনটা-বা কাঁচা। গৌর আমায় বলতেই পারে, মদনদা, তোমার লেখার এ জায়গাটা ঠিক লাগছে না। পালটাও। গান শুনতে শুনতে যেমন কান ঠিক হয়, তেমনি গল্প পড়তে পড়তে চোখ ঠিক হয়, বোধ নিত্যনতুন জন্ম নেয়।

কিন্তু আমেরিকার অভিবাসনীয় ছোটগল্পের উৎস হল স্বদেশে থাকাকালীন জীবনের রোমন্থন যাত্রা। অমাদের অনেকেরই চিন্তা-ভাবনার চাকা ষাট-সত্তর দশকের পর নতুন করে এগোয় নি। আমরা বহুক্ষেত্রে পঞ্চাশ/ষাট/সত্তরের দশকেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছি। সময়ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি, তাই থেমে গেছে কালকের ঘন্টা। কিন্তু আজকের বাংলার সামজজীবন তো থেমে নেই, কতভাবেই না পালটে গেছে সবকিছু। কিছুদিন আগে দোকানে ব্যায়াম করবার জন্য ডামবেল কিনতে গিয়ে বলেছিলাম আমায় দশ পাউন্ডের ডামবেল দিন।

দোকানি হেসে বললেন, স্যার আমরা তো আর পাউন্ড বলি না। এখন সব কেজি। তো এই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। আমরা না আমেরিকান সমাজের না এখানের। তাই আমাদের লেখা ও গল্পসৃষ্টি নিতান্তই বালখিল্যদের।

তবু আমরা তো লিখছি। বাঙালি লিখবেই। আর লিখলে তার প্রকাশও তো দরকার। আমেরিকায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাই নানা - পত্রপত্রিকা বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়। অধিকংশই মূলত ক্লাবপত্রিকা। এছাড়া মাঝে - মধ্যে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে কিছু পত্রিকা বের হয়েছে, আবার বন্ধও হয়ে গেছে। 'আন্তরিক' এবং 'উদয়ন' বলে এমনি দুটি সাহিত্য পত্রিকা বেরুতো। এখন বন্ধ। 'উৎসব' বলে একটি পত্রিকা বেরুচ্ছে, কিন্তু সেটিতে কলকাতার লেখকদেরই লেখা বেশি। ঠিক স্থানীয় পত্রিকা বলা মুস্কিল।

ক্লাব পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় মূলত পুজোর সময়। কিছু ভাল লেখা থাকলেও অধিকাংশ লেখাই কাঁচা। এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার। বর্তমান বাংলা ভাষাগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া। দু'একজন ভালো লেখেন। 'দেশ' পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়-এর একটি সুন্দর ছোটগল্প পড়েছিলাম। লেখেন VOA-র দিলারা হাশেম, বাংলাদেশের লেখিকা। অরবিন্দ ঘোষ।

বাংলাদেশিরা আরও একটু ব্যাপকভাবে বাংলাভাষার চর্চা করেন। তাদের কিছু কিছু পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র তাদের বাংলাভাষার হওয়ায় সেটাকে কেন্দ্র করে একটা লেখকগোষ্ঠী তৈরি হওয়া সম্ভব। এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে আদান - প্রদান হয় কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে নয়। ওখানে সকলেই ব্যস্ত। থেমে দেখবার, ভাববার, লেখবার যেন সময় নেই। পড়বারও সময় নেই। লিখতে গেলে পড়তে হয়। বাংলা বই, পত্রপত্রিকা সেখানে সহজলভ্য নয়। এক 'দেশ' পত্রিকা কেউ কেউ রাখেন। যা মুষ্টিমেয়। আর 'সানন্দা' দেখি কোনও কোনও ড্রইংরুমে। বাংলাভাষাটাকেই মনে রাখা সমস্যা। সৃজনমূলক লেখা দূরের কথা।

ভবিষ্যতের ব্যাপারেও আমি খুব আশাবাদী নই। কারণ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই আবাল্য বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় বড় হচ্ছে। মাতৃভাষা তাদের বাংলা হলেও, ধাত্রীমার ভাষাতেই তারা দক্ষ হয়ে উঠছে। নামে বাঙালি হলেও তারা এখন আমেরিকান। স্কুল, কলেজ, সহপাঠি, অনেক ক্ষেত্রে জীবন - সঙ্গিনীরাও আমেরিকান। তারা অধিকাংশই যতটা বিজ্ঞানমনস্ক, ততটা সাহিত্যমনস্ক নয়। যৎসামান্য যে ক'জন সাহিত্যচর্চা করছে বা করবে— তারা ইংরেজিতেই করবে, বাংলায় নয়। যেমন ধরা যাক ঝুম্পা লাহিড়ির কথা। সে বাঙালির মেয়ে হলেও তার সাহিত্যের মাধ্যম কিন্তু ইংরেজি। ইংরেজি ভাষা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালি জীবন বা ভারতীয় জীবন। এই মিশ্রণ সাহিত্য কতটা সার্থক সাহিত্য হতে পারে, আমার সন্দেহ আছে। হলেও তাকে বাংলা সাহিত্য তো বলা যাবে না। নানা দেশ ও তাদের লেখকরাই তো ইংরেজিতে লেখেন এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই সার্থক হয়, কিন্তু তা তো ইংরেজি সাহিত্যেরই একটা ধারাকে উজ্জীবিত করে — বাংলা ভাষার গাঙে তো সে ঢেউ তোলে না।

আসলে আমেরিকান সংস্কৃতির বিপুলতার মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাসিয়েছি, তারা স্রোতেই হবে হারা। এই চলমান দ্রুত শক্তিশালী স্রোতমুখে বাংলা পলিমাটি জমার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। ভবিষ্যতে এখানে বঙ্গসাহিত্যের কাননভূমি হবে বলে মনে হয় না।

একমাত্র আশা, যদি কোন পাগল - প্রতিভা জন্মায়। সে তো কল্পনা করলেই হবে না। আর ক্রিয়েটিভ রাইটিং - এর ক্লাবেও তাকে পাওয়া যাবে না।

তাই আপাতত আমাদের যেটুকু পাচ্ছি, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।